ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের আমির

শায়খ মৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিযাহুল্লাহ

এর

পরিচয়

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ভূমিকা

"মুমিনদের মধ্য থেকে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ তাদের প্রতিশ্রুতি (শাহাদত) পরিপূর্ণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। এটা এজন্য, যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আফগানিস্তান বিদেশি আক্রমণকারীদের জন্য কবরস্তান। এটা সম্মান, বীরত্ব এবং গৌরবের প্রতীক। এটা বীরদের এবং নবযুগসৃষ্টিকারীদের বাসস্থান। আর এটা জিহাদ, শহীদ এবং ত্যাগের শিক্ষাকেন্দ্র। নবযুগসৃষ্টিকারী বিজয়ী এবং মুজাহিদদের পাশাপাশি এই দেশের মহান আলেমগণ , মুসলিম আইনজীবী (ফকিহ), মুহাদ্দিসীন অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে সুদক্ষ আলেমগণ এবং মুফাস্সিরগণ (পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী) শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কৃতিত্ব প্রদান করেছেন। যদি একদিকে গজনির মাহমুদ, ঘোরের শিহাবুদ্দিন এবং আহমদ শাহ্ আবদালী ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছেন এবং এই এলাকার মুসলিম জনসাধারণকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করেছেন; তবে অন্য দিকে সাজিস্তানের ইমাম আবু দাউদ, খুলমের শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বকর, সমরকন্দের ইমাম আবু লাইস এবং বুস্টের ইমাম ইবনে হুব্বান এর মতো ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং মুফাসসিরগণ তাঁদের বর্ণনা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আলো জ্বেলেছেন। ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মেধাবী তারকাদের দল কাবুল, হেলমান্দ, হেরাত, বল্খ এবং আফগানিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে দেশান্তরে গিয়েছিলেন এবং পবিত্র ভূমি মক্কা, মদিনা এবং দামেস্কে বসবাস করেছিলেন; ইসলামী আইনশাস্ত্র, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এবং পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যামূলক লেখনীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কৃতিত্ব প্রদানের মাধ্যমে তারা ইসলামী খেলাফতের বিখ্যাত সদস্যপদ পেয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.– যিনি মুসলিম বিশ্বে অনুসৃত শ্রেষ্ঠ চারজন মুসলিম ফকিহদের মধ্যে একজন, এবং মাকহুল শামী রহ.– যিনি একজন বিখ্যাত আলেম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের বর্ণনাকারী, ওনারাও সত্যিকারভাবে আফগানিস্তানেরই অধীনে। এইসকল মহাদক্ষ আলেমগণই আফগানিস্তানে

ইসলামী গবেষণা এবং শিক্ষার মহাস্থানসমূহ স্থাপন করেছিলেন, যেগুলোতে শত শত হাজার হাজার আলেমগণ সমগ্র ইতিহাসজুড়ে মুসলিম জনসাধারণকে নির্দেশনা এবং সেবা দেওয়ার জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আফগানিস্তানে শেখা (শিক্ষা গ্রহণ করা) এবং শিক্ষা দেওয়ার এই ধারা, ২০২ হিজরি সনে (প্রায় ৮১৭ খ্রিস্টাব্দ) এটার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অবিরাম চলছে। ইসলামী আইনশাস্ত্র, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, বালাগাত অর্থাৎ ভাষণের ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতাদানবিদ্যা এবং ব্যাকরণশাস্ত্র (শব্দবিন্যাস এবং সংযোজন উভয়টি)-এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত আলেমদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, আফগানিস্তানে ধর্মীয় শিক্ষা পুনর্জীবিত এবং উন্নত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। আফগানিস্তানের এই পদ্ধতি থেকে আলেমদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যোগ্যতা সম্পন্ন হয়; পদ্ধতিটা হলো যে, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তারা প্রয়োজনের সময় তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং দেশকে প্রতিরক্ষা করতে তাদের বিশ্বস্ত শিক্ষকদের কর্তৃক কার্যকরীভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। আফগান মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তৃক কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে অথবা বাহিরে লড়াই করা এই সকল ঐতিহাসিক যুদ্ধে অন্য যে কারোর চেয়ে এই জিহাদী আলেমদের ভূমিকা অমূল্য এবং অধিক প্রখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ ৩৩৮ হিজরি সনে (৯৯৭খ্রি.) গজনির মাহমুদ উলামাদের নির্দেশনা এবং নেতৃত্বের অধীনে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান অংশ বিজয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ৫৫৯ হিজরি সনে,(১১৬৩খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরি-এর রাজত্বকালে এই ধর্মীয় আলেমগণ সরকার গঠনে উচ্চপদস্থ আসনগুলো গ্রহণ করেছিলেন। ১১৬০ হিজরি সনে (১৭৪৬খ্রি.) যখন আফগানিস্তানের মহান শাসক আহমদ শাহ আবদালী ভারতীয় মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তখন এই উদ্দেশ্যের পেছনে তৎকালীন ভারতীয় মহান আলেমগণের জিহাদী অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশনা ছিল। ১২৫৫ হিজরি সনে (১৮৩৮খ্রি.) ঐ সময়ের জিহাদী আলেমগণের মাধ্যমে যে সকল মুজাহিদদের দায়িত্বজ্ঞান জেগেছিল, তারা আফগানিস্তানে ইংরেজ আক্রমণের বিরোধী হয়েছিলেন। ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ানদের প্ররোচনায় দেশীয় কমিউনিস্ট শক্তির এক জঘন্য আঘাতের পর, –যার ফলপ্রসূতে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের উপর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধ্বংসী আক্রমণ হয়– আফগান মুজাহিদ জনসাধারণের নেতৃত্ব এবং নির্দেশনাও আলেমদের হাতে ছিল। আর সাম্প্রতিক অতীতে আফগানিস্তান ইসলামিক ইমারতের ভিত্তিও এই আলেমদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছে, যেটা প্রথম পরিচালিত হয়েছে প্রয়াত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ রহ.-এর দ্বারা এবং তারপর শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার

মুহাম্মদ মানসুর রহ.-এর দ্বারা। এই দুই ধার্মিক এবং সাহসী নেতার পর এখন ইসলামিক ইমারতের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেশের সুপরিচিত এবং সুদক্ষ আলেম, শায়েখ মৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফি.-কে দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তাঁর পরিচয় এবং জীবনী সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সাথে ভাগ করা হয়েছে।

তাঁর জন্ম এবং জন্মের শুরুর সময়কাল :

শায়খ মৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (শায়খ মৌলভী মুহাম্মদ খানের পুত্র এবং মাওলানা খোদা-ই-রাহেম এর নাতি) 'কান্দাহার' প্রদেশের পাঞ্জওয়াই জেলার নাখোনি গ্রামের একটি ধার্মিক এবং উচ্চশিক্ষিত পরিবারে ১৯৬৭ সালের ১৯ অক্টোবর (১৩৮৭ হিজরি সনের ১৫ই রজব) রোজ মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিজ এলাকায় পিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় পরিপূর্ণ করেন।

তাঁর পরিবার :

শায়খ সাহেব এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিবার শিক্ষা, সম্মান এবং ধর্মানুরাগের জন্য সুপরিচিত। এই পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান ছিল কান্দাহার প্রদেশের তাখতাপুল জেলায়। পরে তাঁরা একই প্রদেশের পাঞ্জওয়াই জেলাতে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সম্মানিত শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা তাঁর পরিবারের নতুনভাবে আশ্রিত এই বাসস্থানের নাখোনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা শায়খ মৌলভী মুহাম্মদ খান একজন বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট আইন বিশারদ (ফকিহ) এবং তাঁর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি বিশিষ্ট সামাজিক এবং শিক্ষাগত বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক আলেম হিসেবে স্থানীয় লোকজনকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করতেন এবং পথনির্দেশ করার ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন। তিনি তাঁর এলাকায় একজন শিক্ষক, দা'য়ী এবং সংস্কারক ছিলেন; সেখানে তিনি অনেক ছাত্র প্রস্তুত করেছিলেন এবং পবিত্র ধর্মের খেদমত এবং একে রক্ষা করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ২৭ শে এপ্রিল রোজ মঙ্গলবার, যখন স্থানীয় কমিউনিস্টরা নূর মোহাম্মদ তারাকির নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কাবুলের ক্ষমতা দখল করেছিল; তখন শায়খ মৌলভী মুহাম্মদ খান ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহসী জিহাদী আলেমদের একজন, যারা কমিউনিস্ট এবং তাদের কুফুরি শাসনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠেছিলেন এবং প্রতিরোধ করেছিলেন। স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণ, যারা ইতোমধ্যে শায়খ মৌলভী মুহাম্মদ খানের গভীর প্রভাব এবং অনুপ্রেরণার অধীনে এসে গেছে, তারা দৃঢ়ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং অত্যাধিক পরিমাণে তাঁর জিহাদী সংগ্রামে

অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ এই উত্থাপন নাস্তিক কমিউনিস্ট এবং তাদের অবৈধ শাসনের জন্য হুমকি এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, ঐ কারণেই তারা এই জিহাদী অভ্যুত্থানের প্রকৃত উৎসাহদাতাকে অপসারণের পরিকল্পনা করেছিল। তৎকালীন কাফের সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী শায়খ সাহেব-এর বাড়ি এবং মাদরাসাতে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য হামলা করেছিল, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি নিরাপদ ছিলেন। তারপর তিনি কান্দাহার প্রদেশের রেগো (তাঁর মরুভূমি) এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এই কাজের জন্য একনিষ্ঠ অন্যান্য মুজাহিদদের সহযোগিতায় কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই শুরু করেছিলেন। জিহাদী প্রতিরোধের সম্প্রসারণ এবং ক্রমশ সফলতার সাথে শায়খ মৌলভী জনবহুল এলাকায় ফিরে এসেছিলেন। আর তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত জিহাদী এবং শিক্ষামূলক সেবাসমূহে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর এবং তৎকালীন সোভিয়েত যোদ্ধাদের নির্মমতা বৃদ্ধির কারণে অন্যান্য হাজারো গ্রামবাসীদের মতো তাঁর বাড়ি এবং গ্রাম ছেড়েছিলেন এবং প্রতিবেশী পাকিস্তানে দেশান্তরিত হয়েছিলেন। আর সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তানে 'জঙ্গল পীর আলিজাই'-এর শরণার্থী ক্যাম্পে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির মুক্তিদানের খাতিরে এবং সেখানে একটি কার্যকর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য সকল শরণার্থীদের মতো জীবনের সকল বাধা এবং অসুবিধাকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে বসবাস করেছিলেন ।

তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা :

'শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা' তাঁর পিতার ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ পিতা থেকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সম্মানিত এবং সুপণ্ডিত পিতা থেকে পবিত্র কুরআনের পঠন, ব্যাকরণ এবং আরবী ভাষার সাহিত্য, বক্তৃতাদানবিদ্যা এবং ইসলামী আইনশাস্ত্র শিখেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিপূর্ণ করার পর উচ্চতর শিক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি সুপরিচিত আঞ্চলিক মাদরাসাগুলোতে এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সকল প্রয়োজনীয় এবং গতানুগতিক শিক্ষা পরিপূর্ণ করেছিলেন। ১৪১১ হিজরি সনে (১৯৯১খ্রি.) বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট আঞ্চলিক আলেম মৌলভী মুহাম্মদ জান আগা সাহেব এবং মৌলভী হাবিবুল্লাহ সাহেব থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন এবং তদানুসারে সনদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর জিহাদী এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম :

যখন শায়খ সাহেব তাঁর শিক্ষার সমাপ্তির কাছে পৌঁছালেন তখন তৎকালীন সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল। এমন একটা সময় ছিল যখন প্রত্যেক আফগান– বিশেষভাবে ধার্মিক এবং সুপণ্ডিত পরিবারগুলোর অধীন যুবকেরা তৎকালীন বিদেশি যোদ্ধা এবং তাদের দেশীয় কমিউনিস্ট পুতুলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিভিন্ন জিহাদী ফ্রন্টে যোগদান করার জন্য পুরোপুরি উৎসাহী ছিল। শায়খ হাইবাতুল্লাহ সাহেব একটি শিক্ষিত এবং ধার্মিক পরিবারের সন্তান, তিনি বিদেশি আক্রমণকারী এবং তাদের দেশীয় কমিউনিস্ট পুতুলদের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শ এবং জিহাদী উভয় ময়দানে যুদ্ধ করতে অন্য যে কারো চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এমনকি তাঁর পড়াশোনার সময় বিভিন্ন ময়দানে মুজাহিদদের সাথে সময় ব্যয় করতে তাঁর পরিকল্পনা ছিল। মাদরাসার বার্ষিক ছুটির দিনে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত যোদ্ধা এবং তাদের দেশীয় দালাল কমিউনিস্ট বাহিনীদের বিরুদ্ধে কার্যকর জিহাদী সংগ্রামের জন্য কান্দাহার প্রদেশের সুপরিচিত জিহাদী কমান্ডার মোল্লা হাজী মুহাম্মদ আখুন্দ-এর দলে যোগ দিতেন। সারা আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে মোল্লা হাজী মুহাম্মদ আখুন্দ-এর জিহাদীদল বিখ্যাত ছিল, যেটাতে থেকে শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মানসুর রহ. এবং ইসলামিক ইমারতের সহকারি সরকার প্রধান আলহাজ্ব মোল্লা মুহাম্মদ হাসান-এর মতো বিশিষ্ট তালেবান নেতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন মুখ্য ব্যক্তিত্বরা সোভিয়েত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ করেছিলেন। সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রাথমিক উন্নতির দিকে এই জিহাদী দল প্রয়াত মৌলভী মুহাম্মদ নবী মুহাম্মদী কর্তৃক পরিচালিত হরকত-ই-ইনকিলাবি ইসলামি (অর্থাৎ ইসলামী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান– মুজাহিদদের দ্বারা গঠিত সাতটি প্রধান জিহাদী দলের একটি)-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। পরে এটি প্রয়াত মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস খালিস-এর নেতৃত্বের অধীনে হিজব-ই-ইসলামী দলের মাধ্যমে বর্ধিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিল। শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা এই জিহাদী দলের বিশিষ্ট সদস্যদের একজন ছিলেন। তিনি আফগানিস্তান ইসলামিক ইমারতের পূর্বের উভয় নেতা (অর্থাৎ প্রয়াত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ এবং শহীদ আমিরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর)-এর সাথে যৌথ-সামরিক এবং জিহাদী অপারেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপারেশনগুলোর একটিতে আহতও হয়েছিলেন, যদিও শায়খ সাহেব তাঁর অধিকাংশ সময় জিহাদী কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য মুজাহিদদের তালিম দেওয়ার মধ্যে ব্যয় করেছেন। তারপরও তিনি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত কান্দাহার প্রদেশে ‘রুমমেট’ নামে পরিচিত ভিন্ন ধরনের জিহাদী দল পরিচালনা করেছিলেন। এমনকি

বিভিন্ন জিহাদী ময়দানে সরাসরি অংশগ্রহণের সময়ও কাফের এবং অন্য বিপথগামী দলগুলোর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের ভাবাদর্শগত প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতার উপর শায়খ সাহেবের প্রধান মনোযোগ ছিল; কেননা নাস্তিক কমিউনিস্ট এবং তাদের বিদেশি সোভিয়েত সহযোগী শুধু আমাদের প্রিয় জন্মভূমির অঞ্চলগুলোতেই আক্রমণ করেনি, বরং আমাদের ধার্মিক মুসলিম জনসাধারণকে বিপথগামী করতে ধর্মবিরোধী ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিল এবং অনেক সময় এমনকি সামরিক আক্রমণের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় এবং কঠিন হয়েছিল ভাবাদর্শগত আক্রমণের খোলাখুলি বাধা দেওয়া। এই কারণেই শায়খ সাহেব রণাঙ্গন এবং মাদরাসা উভয়স্থানে মুজাহিদদের মানসিক এবং ভাবাদর্শগত প্রশিক্ষণ ও সতর্কতার উপর নজর রেখেছিলেন। এইভাবে এই মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি একটি মহৎ এবং প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন।

ধর্মীয় পড়াশোনা শিক্ষাদানে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব :

শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ধর্মীয় শিক্ষা– বিশেষভাবে ইসলামী আইনশাস্ত্র, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের ব্যাখ্যা শিক্ষাদানে শ্রেষ্ঠ এবং সুদক্ষ ছিলেন। ১৪১১ হিজরি সনে (১৯১১খ্রি.) তাঁর পড়াশোনা শেষ করার পর অন্যসব জিহাদী এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি সর্বদা এই বিষয়গুলো শিক্ষাদান করেছিলেন এবং জ্ঞানের সন্ধানে আসা অনেক শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তিনি শায়খ হিসেবে আখ্যায়িত যেটার মানে হলো যে, তিনি আস সিহাহ-আস সিত্তাহ (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের সর্বাধিক বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধ ছয়টি সংগ্রহ) শিক্ষাদানে সুদক্ষ।

তাঁর বর্ণনার ধারা– যেটার উপর হাদিসের ভিত্তি, অবিঘ্নিতভাবে শাইখুল হাদিস মৌলভী মুহাম্মদ জান আগা সাহেব এবং শাইখুল হাদিস মৌলভী হাবিবুল্লাহ সাহেব হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তালেবানের ইসলামী আন্দোলনে তাঁর প্রতিষ্ঠাতা ভূমিকা :

আফগানিস্তান থেকে তৎকালীন সোভিয়েত যোদ্ধাদের অপসারণ এবং কমিউনিস্ট শাসনের পতনের পর দুর্ভাগ্যবশত দেশের বিভিন্ন অংশে অভ্যন্তরীণ বিরোধপূর্ণ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাও তাঁর দলের অন্যান্য ধার্মিক এবং খাঁটি মুজাহিদদের মতো এই বিরোধপূর্ণ যুদ্ধে অংশ নেননি এবং তাঁদের শিক্ষাবিষয়ক এবং পুনর্গঠন কর্মকাণ্ড আবারও শুরু করেছিলেন। যদিও কান্দাহার প্রদেশ এই বিরোধপূর্ণ যুদ্ধের ফুটন্ত কেন্দ্র ছিল এবং বিভিন্ন স্থানীয় কমান্ডাররা এই যুদ্ধে জড়িত হয়েছিল, তবে শায়খ সাহেব জিহাদী ময়দানের একজন শিক্ষক এবং পরিচালক হিসেবে লোকজনকে

সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য শিক্ষাদান এবং নির্দেশনা দেওয়ার যথার্থ কাজ আবারও শুরু করেছিলেন। যখন বিরোধপূর্ণ যুদ্ধ এবং অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রয়াত মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ.-এর নেতৃত্বের অধীনে তালেবানের ইসলামী আন্দোলন উদ্ভাবিত হয়েছিল, তখন শায়েখ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা খুব শুরুলগ্ন থেকেই একজন একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক জিহাদী সঙ্গী হিসেবে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তালেবানের ইসলামী আন্দোলনের দ্রুত উন্নতি এবং সেখানে প্রশাসনের পুনঃপ্রবর্তনের সাথে কান্দাহার প্রদেশে সামরিক আদালতও পুনরানয়ন করা হয়েছিল। এই আদালতে জাতীয় পর্যায়ে বিশিষ্ট এবং দক্ষ ব্যক্তিত্বরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, আর শায়েখ সাহেব হাইবাতুল্লাহ তাঁদের একজন ছিলেন, যেহেতু তিনি তাঁর উচ্চশিক্ষা, প্রখর আইন-উপলব্ধি এবং ধর্মনিষ্ঠা এমনকি পূর্ব জিহাদী যুগে থাকায় এই আন্দোলনের নেতৃত্বের পরিচিত ছিলেন।

সামরিক আদালতের প্রধান হিসেবে তাঁর নিযুক্তি :

১৯৯৬ সালে যখন রাজধানী কাবুল শহর আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, তখন শায়খ সাহেব হাইবাতুল্লাহ প্রয়াত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ রহ. এর একটি বিশেষ ফরমানে কাবুল সামরিক আদালতের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদালতগুলোকে শৃঙ্খলিত করতে এবং কাবুল শহরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ করতে তিনি দেশের পূর্বাঞ্চলে সামরিক আদালতের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পূর্বাঞ্চলে বিশেষভাবে নানগারহার প্রদেশে সামরিক আদালতের পুনঃপ্রবর্তনের এবং সেখানে সক্রিয়ভাবে দুই বছর খেদমত করার পর প্রয়াত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি কাবুলে ফিরে এসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে সামরিক আদালতের প্রধান হিসেবে খেদমত করেছিলেন।

কেন সামরিক আদালতের ইনচার্জ হিসেবে?

ইসলামিক ইমারতের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ছিল দেশের ভেতরে আইন এবং আদেশের বাস্তবায়ন এবং শান্তির পুনরুদ্ধার করা, যেটা অকাট্য সত্য ছিল এমনকি ইসলামিক ইমারতের শত্রুরাও এটি স্বীকার করেছিল। অন্যান্য সংশোধনের পাশাপাশি হুদুদের (অর্থাৎ নির্দেশিত শাস্তি) বাস্তবায়ন, যুদ্ধাক্রান্ত একটি দেশে শান্তির পুনরুদ্ধার এবং স্থায়িত্বে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। শুরুতে অ্যাডমিন, নিরাপত্তা এবং বিচারব্যবস্থাসহ সকল অঙ্গের নেতারা অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল ছিল, কিন্তু শুধু ঐসকল নির্দেশিত শাস্তি বাস্তবায়নের কারণেই প্রায় দুই দশক ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত

এবং অরাজকতার একটি দেশে শান্তি এবং স্থায়িত্বের পুনরুদ্ধার হয়েছিল। একমাত্র শরিয়াহ আইনের সম্পাদনই শান্তি এবং স্থায়িত্বের পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করতে পারে, যদি এটা ইসলামী শাসন এবং ব্যবস্থাপনের সত্যিকার উদ্দীপনা অনুসারে বাস্তবায়িত হয়। ঐ কারণেই ইসলামিক ইমারতের নেতৃত্বগণ আদালতসমূহ এবং বিচারপতিগণের প্রধান হিসেবে কার্যক্ষম এবং দক্ষ লোক নিয়োগদানে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন; যাকে পবিত্র কুরআন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এবং ইসলামী বিচারব্যবস্থার আলোকে নির্দেশিত শাস্তি (হুদুদ)-এর বাস্তবায়নে সামরিক আইনের উদ্দেশ্য এবং দর্শন সম্পর্কে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অবগত হতে হবে। শরিয়াহ আদালতসমূহ নির্দেশিত শাস্তি (হুদুদ)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল, অন্যদিকে সামরিক আদালতসমূহ বিভিন্ন জিহাদী ময়দানগুলোতে ইসলামিক ইমারতের সামরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীদের সামলানো এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। তাই সামরিক আদালতগুলোর প্রধান হিসেবে এমন কাউকে নিয়োগ দেওয়া বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়, যে পেশাদার দক্ষ এবং সামরিক আইনের বিচার এবং কার্যসম্পাদনে সূক্ষ্ম ক্ষমতাসম্পন্নসহ মেধাবী হবে। অন্যদিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহী পোস্টগুলোতে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দুইটি মানদণ্ড অপরিহার্য। প্রথমত তার জিহাদী রেকর্ড এবং দ্বিতীয়ত জ্ঞান। শায়খ হাইবাতুল্লাহ সাহেব তাঁর পেশাদার সহকর্মীদের কর্তৃক সম্মত এবং নিশ্চিত হয়েছিলেন, যে তিনি এই উভয় গুণে গুণান্বিত। এজন্যেই তিনি প্রয়াত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ. কর্তৃক সামরিক আদালতের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল কাজ সম্পাদন করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রয়াত আমিরুল মুমিনীন রহ.-এর এই নির্বাচনে কিছু চিন্তাভাবনা এবং যুক্তিযুক্ততা ছিল, যা নিচে নির্দিষ্ট হয়েছে :

* সামরিক আদালত– রাজধানী কাবুল শহরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল, যেটা নির্দেশিত শাস্তি (হুদুদ) বাস্তবায়নে মনোনীত ছিল।

* একদিকে শান্তির পুনরুদ্ধার এবং সমাজের সংস্কারের জন্য 'নির্দেশিত শাস্তি'-এর বাস্তবায়ন প্রয়োজনীয় ছিল; অন্যদিকে নির্বাহকের শিক্ষা, আইন উপলব্ধি এবং স্পষ্টতা সমানভাবে প্রয়োজনীয় ছিল।

* অনুরূপভাবে পূর্বোল্লিখিত প্রতিভার পাশাপাশি নির্বাহককে সু-বিবেচক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তি হতে হবে। প্রয়াত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ. ইতোমধ্যে এই সম্ভাবনাগুলো শায়েখ সাহেব এর মধ্যে নির্ধারণ করেছিলেন, এ কারণেই তিনি (শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা) এই অপরিহার্য পোস্টটির জন্য

মনোনীত হয়েছিলেন। সামরিক আদালতের বিচারকগণ এবং পেশাদারদের কর্তৃক কিসাস (অর্থাৎ প্রতিশোধমূলক শাস্তি) বাস্তবায়নের পূর্বে শায়খ হাইবাতুল্লাহ সাহেব ব্যক্তিগতভাবে হত্যাকারীর জন্য ক্ষমাশীলতা সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস নিহতের উত্তরাধিকারীদের পুনরায় স্বরণ করানোর মাধ্যমে হত্যাকারীর থেকে দিয়্যাত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) নিয়ে তাকে ক্ষমা করার জন্য তাদেরকে বলতেন। তিনি একজন কর্তৃপক্ষ হিসেবে নয়, কেবল একজন ধর্মীয় আলেম ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে নিহতব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হত্যাকারীকে ক্ষমা করার জন্য বলতেন। অধিকাংশ মামলায় তাঁর অবিরত প্রচেষ্টার ফলে যেসব লোকেরা প্রতিশোধমূলক শাস্তি পাওয়ার জন্য অভিযুক্ত ছিল, তারা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এইভাবে একটি নতুন জীবনের সুযোগ পেয়েছিল। অনুরূপভাবে অপরাধমূলক মামলায় যখনই সংশ্লিষ্ট বিচারক কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, শায়খ সাহেব ইসলামিক বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং আইনসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাথর ছোড়া ঘুরাতেন এবং তাতে প্রদত্ত সুবিধা হতে পূর্ণ সুযোগ নিতেন। তিনি এমন শাস্তির সম্পাদন বন্ধ করতে সুপরিচিত নিয়ম ব্যবহার করতেন যেটা বলেছে যে, সন্দেহের জন্য প্রতিশোধমূলক শাস্তি নাকচ হয়।

উপরোল্লিখিত বর্ণনায় দেখা যায় যে, শায়খ হাইবাতুল্লাহ সাহেব একজন সতর্ক, যত্নশীল, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সহানুভূতিশীল এবং দয়াশীল হিসেবে আফগানিস্তান ইসলামিক ইমারতের সর্বাধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারব্যবস্থা অঙ্গের একটিতে শরিয়ার আইন এবং শাসনের বাস্তবায়নে তাঁর দায়িত্ব পালনের ভূমিকা পরিপূর্ণ সফল এবং নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেছেন। এমনকি আজও এই মেধা এবং ক্ষমতা থাকায় তিনি ইসলামিক শরিয়াহ আইনের নিয়মাবলী এবং আইন অনুসরণ এবং কার্যকর করার মাধ্যমে জিহাদের পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনে নিষ্ঠাবান এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে পুনরায় জিহাদ চালু করার ব্যাপারে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা :

২০০১ সালে যখন আমেরিকান যোদ্ধাদের দ্বারা তাদের পশ্চিমা স্বজাতীয় জোটবাহিনীর সহযোগিতায় আফগানিস্তান আক্রান্ত হয়েছিল, আর ইসলামিক ইমারতের নেতৃত্বগণ একটা সংক্ষিপ্ত যুদ্ধকৌশল সময় পর আবার মুজাহিদদেরকে সংগঠিত এবং সমন্বিত করতে শুরু করেন, তখন শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা অন্যান্য দায়িত্বশীল লোকদের কর্তৃক সমর্থিত এবং সহযোগী হয়ে নতুন বিদেশি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জিহাদের পুনর্জাগরণ এবং সংগঠনে কার্যকর এবং মুখ্যভূমিকা রেখেছিলেন। শুরুতে আমেরিকান

আক্রমণকারী বাহিনীর কঠিন নজরদারি এবং অনুসরণ করার কারণে কোনো জিহাদী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু শায়খ হাইবাতুল্লাহ সাহেব অন্যান্য কিছু বীর আলেম এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ঐ গুরুতর এবং চ্যালেঞ্জিং অবস্থায় নতুন অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর আক্রমণকারীদের সামনে দাঁড়াতে আরও একবার মুজাহিদদের জমায়েত এবং সংগঠিত করতে অবিশ্রান্তভাবে কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রয়াত শায়খ গোলাম হায়দার, শহীদ শায়খ আব্দুস সালাম এবং সম্মানিত শায়খ আব্দুল হাকেম (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) প্রধান এবং বীর ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যারা কাফের ক্রুসেড যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং যুদ্ধ করার জন্য আমাদের দেশের মুসলিম জনসাধারণকে আহ্বান এবং একত্রিত করতে শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা-এর সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। শায়খ সাহেব তাঁর গভীর শিক্ষার কারণে কুরআনের পাঠ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের আলোকে লোকজনকে বলার মাধ্যমে তাদেরকে আহ্বান ও উপলব্ধি করাতে পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিলেন যে, আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও দেশকে প্রতিরক্ষা করা প্রধান ফরজগুলোর মধ্যে একটি, যেটি পরিহার করা যাবে না। অত্যাচারী আমেরিকান আক্রমণকারীর নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার জোটসমূহ এবং বাস্তবধর্মী অস্ত্রশস্ত্র এবং আধুনিক প্রযুক্তির সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা এবং যুদ্ধ করার জন্য ইমানদার ও খালি হাতবিশিষ্ট এবং রণক্লান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছিল, যা সহজ কাজ ছিল না। যদিও বীর আফগান জাতি প্রাক্তন সোভিয়েত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। সেখানে শহীদ হয়েছিলেন প্রায় দেড় মিলিয়ন, শরনার্থী হয়েছিলেন সাত মিলিয়ন, বন্দি হয়েছিলেন মিলিয়নাধিক এবং অসংখ্য মানুষ আহত এবং বিকলাঙ্গ হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু দলের নেতাদের মধ্যে অসন্তোষের কারণে –যেটা ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধপূর্ণ যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল– এইসকল ত্যাগসমূহ বৃথা গিয়েছিল। এইভাবে মুসলিম আফগান জনসাধারণকে গভীরভাবে নিরাশ এবং হতাশ করেছিল। কিন্তু শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা এবং তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মীদের সাহসিকতা এবং সংকল্পের মাধ্যমে তাঁরা অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য এবং লজিক্যাল যুক্তির মাধ্যমে আফগান লোকজনকে বুঝিয়েছিলেন, যেটা আমেরিকান আক্রমণকারীদের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কাফের জোটের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে এবং প্রতিহত করতে পরিশ্রান্ত এবং নিরাশ আফগান জনসাধারণের মধ্যে একটা নতুন সাহসিকতা এবং উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। মোকাবেলার সময় মুসলিম আফগান জনসাধারণ প্রমাণ করেছিল যে, এমনকি যদিও তারা ক্লান্ত এবং খালি হাতবিশিষ্ট হয়, তবুও তারা

পারে এবং তারা নতুন বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, যেহেতু তারা সুনিশ্চিত এবং আশ্বস্ত যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হিসেবে চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। সত্যিকারভাবে শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের মতো সাহসী নেতাদের সাহসিকতা এবং দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, আমাদের দেশের মুসলিম জনসাধারণ এবং ইসলমিক ইমারতের মুজাহিদদের উত্তেজিত এবং অনুপ্রাণিত করা; যেটা আমেরিকান সুপার পাওয়ার এবং ন্যাটো-বিশ্বে ক্রুসেড বাহিনীর সর্বোচ্চ সামরিক জোট-এর জন্য অপমানজনক এবং হতবুদ্ধিকর পরাজয় বয়ে এনেছিল। বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এই সফল প্রতিরোধ এবং জিহাদী সংগ্রামের গত ১৫ বছরে শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ইসলামিক ইমারতের বিভিন্ন অঙ্গে খেদমত করেছেন, যেমন- আহ্বান ও নেতৃত্ব কমিশন (পরওয়ানা) এবং আদালতের সাধারণ পরিচালকমণ্ডলীকে বাতিলকরণ ইত্যাদি।

ইসলামিক ইমারতের সহকারী প্রধান হিসেবে :

২০১৫ সালে যখন প্রয়াত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ.-এর মারা যাওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছিল এবং শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মানসুর রহ. ইসলামিক ইমারতের নতুন আমির হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলেন, তখন শায়খ হাইবাতুল্লাহ সাহেব ডেপুটি (সহকারী) প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর রহ. অসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং মেধাবী লোক ছিলেন। তিনি জানতেন যে, সকল প্রধান ব্যক্তিত্ব ইসলামিক ইমারতের বিভিন্ন অঙ্গে এবং বিভিন্ন পদমর্যাদায় কাজ করছেন এবং তাঁদের দক্ষতা ও কুশলতা অনুরূপে পোস্টগুলোতে তাঁদের মনোনীত করা হয়েছিল। শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সাহেব এসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন, যাঁর শিক্ষা এবং কাজ করার সক্ষমতা এবং সকল পদমর্যাদার মুজাহিদদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর রহ. কর্তৃক অনুভূত হয়েছিল। এ কারণেই নতুন বিন্যাসে তাঁর (শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা) একাডেমিক এবং প্রশাসনিক দক্ষতা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আফগানিস্তান ইসলামিক ইমারতের সহকারী প্রধান হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই নিযুক্তি পরিপূর্ণ সঠিক এবং সফল ছিল, কেননা এটা সকল প্রশাসক এবং রণক্ষেত্রের মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং বিভেদ থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখতে শহীদ আমীরুল মুমিনীনকে বহুলভাবে সাহায্য করেছিল। শায়খ সাহেব পূর্ণ দশমাস ইসলামিক ইমারতের সহকারী প্রধান হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন। ইতোমধ্যে ইসলামিক ইমারতের নেতার বিরুদ্ধে অসভ্য

আমেরিকান আক্রমণকারী এবং তাদের সাহায্যকারীদের হুমকি এবং চাপ তীব্রতর হতে থাকে। ইসলামিক ইমারতের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু যথাবিধি ঘোষণার পর কিছু লোক নতুন নেতার নিযুক্তিতে সম্মত ছিলেন না। ওই সময়ে শায়খ সাহেব হাইবাতুল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ এবং গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক সংকটময় মুহূর্তে শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ইসলামিক ইমারতের মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে কোনো চেষ্টা করা ছাড়েননি। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট আলেম, জাতীয় ব্যক্তিত্ব এবং জিহাদী কমান্ডারদের সাথে কতিপয় বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছিলেন, যেগুলোতে তিনি এক নেতৃত্বের অধীনে একতার শক্তি এবং উপকারিতার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টাসমূহ সফল প্রমাণিত হয়েছিল এবং মুজাহিদরা বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যেহেতু তাঁরা শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ মনসুর রহ.-এর নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ থেকেছিলেন। সকল প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং রণক্ষেত্রের কমান্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন আমীরকে সমর্থন করেছিল এবং আনুগত্যের শপথ করেছিল এবং অসভ্য আমেরিকান আক্রমণকারী এবং তাদের বিদেশি স্বজাতীয় ও দেশীয় বেতনভুগী বাহিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ আফগানিস্তানের ৩৪ জেলার সবগুলো থেকে গৃহিত হয়েছিল। ২০১৬ সালের ২১শে মে রোজ শনিবার, যখন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ আখতার মানসুর রহ. আমেরিকান আক্রমণকারীদের একটি ড্রোন হামলায় শহীদ হয়েছিলেন, তখন শায়খ সাহেব হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ইসলামিক ইমারতের পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্যদের সর্বসম্মত সম্মতিতে নতুন প্রধান (আমির) হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন খলিফা সাহেব সিরাজ উদ্দীন হক্কানি এবং মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদ (প্রয়াত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদের পুত্র) ইসলামিক ইমারতের সহকারী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শায়খ সাহেবের ইসলামিক ইমারতের নতুন নেতা হিসেবে নিযুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো– এক নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে ইসলামিক ইমারতের সকল পর্যায়ের মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ রাখার মাধ্যমে অসভ্য আমেরিকান আক্রমণকারী এবং তাদের দেশীয় বাহিনীসমূহের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি। যদিও ইসলামিক ইমারতের পরিচালনা পরিষদের কিছু সদস্য ব্যাপক সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা লাভ করছিলেন, তবে তাঁদের কেউই তাঁর শিক্ষাগত এবং জিহাদী সম্মানের কারণে নতুন নেতা হিসেবে শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা-এর নিযুক্তির বিরোধিতা করেননি, আর এভাবে তাঁর নিযুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত এবং অনুমোদিত হয়েছিল। বাস্তবিকভাবে নতুন নেতা হিসেবে তাঁর নিযুক্তি মুজাহিদদের একতা সংরক্ষণে

প্রধান বিষয়ের একটি ছিল এবং এভাবে আফগানিস্তানে জিহাদের চলমান উদ্দেশ্য উন্নত হচ্ছে। শায়খ সাহেব কিছু বিশিষ্ট গুণাবলী প্রদত্ত; এ কারণেই তিনি ইসলামিক ইমারতের সকল সদস্য কর্তৃক –তাঁদের পদমর্যাদা এবং উপাধি যাইহোক– গভীরভাবে সম্মানিত এবং পছন্দনীয়। তিনি তাঁদের সকলের জন্য সুখ্যাতিসম্পন্ন এবং বিশ্বস্ত। তিনি আকর্ষণের অনন্য প্রতিভা নিয়ে এবং সকল মুজাহিদীন ও দায়িত্বশীল লোকদেরকে একসাথে রাখতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রদত্ত উপহার।

তাঁর ধর্মীয় এবং ভাবাদর্শগত উপলব্ধি :

আফগানিস্তানের অন্য সকল মর্যাদাপূর্ণ আলেমদের মতো শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সাহেব একজন একনিষ্ঠ ধর্মীয় আলেম এবং হানাফি মাযহাবের অনুগত (মুসলিম বিশ্বে ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি সর্বোচ্চ জনপ্রিয় মাযহাবের একটি) এবং কুরআন ও সুন্নাহের অনুসারী। তিনি মুসলিমদের মধ্যে সকল ভাবাদর্শগত, বিরোধপূর্ণ এবং ভাষাগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তিনি ধর্মে সকল বৈধর্ম (প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস) এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তাঁর উপলব্ধি অনুসারে মুসলিম জনসাধারণের সফলতা তাদের ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ পার্থক্য এবং বিভাজন তাদের দুর্দশার প্রধান কারণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাত (অর্থাৎ জীবনী) এবং তাঁর জিহাদী সাফল্যসমূহ পড়তে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী। ১৯৯৯ সালে হাজ্জ সম্পাদনের পর তিনি পবিত্র শহর মদিনাতে উহুদ পাহাড় পরিদর্শন করতে অনেক উৎসাহী হয়েছিলেন; যেখানে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধের সময় আহত হয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় এবং সাহসী চাচা হযরত হামযা রাযি.-এর সমাধিক্ষেত্র দেখতেও তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন।

দৈনন্দিন জীবনে তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য :

শায়খ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা কিছু বিশেষ গুণাবলীতে উৎকৃষ্ট, যেটার জন্য তিনি ইসলামিক ইমারতের সকল সদস্য এবং মুজাহিদদের মধ্যে সর্বোচ্চ জনপ্রিয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন বিবেচিত। পূর্বোল্লিখিত হিসেবে শহীদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর রহ.-এর নিযুক্তির সময় শায়খ সাহেব হাইবাতুল্লাহ ইসলামিক ইমারতের সকল সদস্যগণ এবং মুজাহিদদের ঐক্যবন্ধনে একটি চমৎকার এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর নিজের নিযুক্তিতে শায়খ সাহেবকে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং মুজাহিদদের রণক্ষেত্রের কমান্ডারগণ সর্বসম্মতিক্রমে কোনো আপত্তি ছাড়া তাঁদের আনুগত্যের অঙ্গীকার দিয়েছিলেন। যেটা প্রমাণ করেছিল যে, তিনি সকল সংকটপূর্ণ ঘটনায় একতার প্রতীক। গত দশ বছর ধরে শায়খ সাহেব প্রতিনিয়ত

পবিত্র কুরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের শিক্ষাদান করেছিলেন। এ কারণেই তিনি সারা দেশের অসংখ্য আলেমের শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি যে, অনেক আলেম তাঁর শাগরেদ এবং অনুসরণকারী। তাঁর বাকপটুতার কারণে তাঁর সকল শাগরেদের মধ্যে তিনি পুরোপুরি জনপ্রিয় এবং গভীরভাবে সম্মানিত। যথেষ্ট সুবিবেচনা গ্রহণ করার পর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে তিনি পরিপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও চূড়ান্ত এবং অটল। তিনি সর্বাধিকভাবে নিরব থাকেন এবং বৈঠকসমূহে অধিক শুনেন, কিন্তু যখন তিনি কথা বলেন তাঁর কথাগুলো হৃদয়গ্রাহী এবং বিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। যদিও তাঁর বয়স পঞ্চাশের মধ্যে তথাপি এখনও তিনি গভীরভাবে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং জিহাদের মহান উদ্দেশ্যের জন্য তাঁদেরকে প্রস্তুত করতে অনুসক্ত এবং আগ্রহী। তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- প্রশান্তি, কার্যপদ্ধতির সম্মান এবং সহানুভূতি। তাঁর দৈনন্দিন জীবন সরল এবং সকল বাহ্যিক লৌকিকতা থেকে মুক্ত। বিলাসিতা অথবা অতিপ্রাচুর্যের কোনো নিদর্শন তাঁর খাওয়া, পান করা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং জীবন পদ্ধতিতে দেখা যায় না। বৈঠক এবং মেলামেশায় কেউ তাঁকে দরদী বড় ভাই এর মতো অথবা কেবল সদয় শিক্ষকের মতো পায়। তিনি জিহাদী সকল কর্মকাণ্ডে খুবই প্রখর, আর আপাতত পড়াশোনা এবং শিক্ষাদানের পরিবর্তে এইসকল কাজগুলোকে সংগঠিত এবং সমন্বিত করতে তাঁর অধিক সময় ব্যয় করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে নিরাপদে রাখুন!!!
তিনি তাঁর সকল মহৎ আকাঙ্খায় সফল হোন!!!

ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা:

সাংস্কৃতিক বিষয়াবলীর জন্য কমিশনের ইতিহাস বিভাগ।

অনুবাদ ও পরিবেশনায়:

আর-রিবাত মিডিয়া

আপনাদের নেক দু'আয় আমাদের ভুলবেন না।